আন্ নূর

২৪

নামকরণ

পঞ্চম রুকূ'র প্রথম আয়াত اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরাটি যে বনীল মুস্তালিক যুদ্ধের সময় নাযিল হয়, এ বিষয়ে সবাই একমত। কুরআনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত আয়েশার' (রা) বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের ঘটনা প্রসংগে এটি নাযিল হয়। (দ্বিতীয় ও তৃতীয় রুকূ'তে এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে)। আর সমস্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী বনীল মুস্তালিক যুদ্ধের সফরের মধ্যে এ ঘটনাটি ঘটে। কিন্তু এ যুদ্ধটি ৫ হিজরী সনে আহযাব যুদ্ধের আগে, না ৬ হিজরীতে আহযাব যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয় সে ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা যায়। আসল ঘটনাটি কি? এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের প্রয়োজন এ জন্য দেখা দিয়েছে যে, পরদার বিধান কুরআন মজীদের দু'টি সূরাতেই বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি সূরা হচ্ছে এটি এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সূরা আহযাব। আর আহযাব যুদ্ধের সময় সূরা আহযাব নাযিল হয় এ ব্যাপারে কারোর দ্বিমত নেই। এখন যদি আহযাব যুদ্ধ প্রথমে হয়ে থাকে তাহলে এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, পরদার বিধানের সূচনা হয় সূরা আহযাবে নাযিলকৃত নির্দেশসমূহের মাধ্যমে এবং তাকে পূর্ণতা দান করে এ সূরায় বর্ণিত নির্দেশগুলো। আর যদি বনীল মুস্তালিক যুদ্ধ প্রথমে হয়ে থাকে তাহলে বিধানের বিন্যাস পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সূচনা সূরা নূর থেকে এবং তার পূর্ণতা সূরা আহযাবে বর্ণিত বিধানের মাধ্যমে বলে মেনে নিতে হয়। এভাবে হিজাব বা পরদার বিধানে ইসলামী আইন ব্যবস্থার যে যৌক্তিকতা নিহিত রয়েছে তা অনুধাবন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ উদ্দেশ্যে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবার আগে নাযিলের সময়কালটি অনুসন্ধান করে বের করে নেয়া জরুরী মনে করি।

ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন বনীল মুস্তালিক যুদ্ধ হিজরী ৫ সনের শাবান মাসে অনুষ্ঠিত হয় এবং তারপর ঐ বছরেরই যিলকাদ মাসে সংঘটিত হয় আহযাব (বা খন্দক) যুদ্ধ। এর সমর্থনে সবচেয়ে বড় সাক্ষ হচ্ছে এই যে, হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের ঘটনা প্রসংগে হযরত আয়েশা (রা) থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর কোন কোনটিতে হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা) ও হযরত সা'দ ইবনে মু'আযের (রা) বিবাদের কথা পাওয়া যায়। আর সমস্ত নির্ভরযোগ্য হাদীস অনুযায়ী হযরত সা'দ ইবনে মু'আযের ইন্তিকাল হয় বনী কুরাইযা যুদ্ধে। আহযাব যুদ্ধের পরপরই এ যুদ্ধটি অনুষ্ঠিত হয়। কাজেই ৬ হিজরীতে তাঁর উপস্থিত থাকার কোন সম্ভাবনাই নেই।

www.icsbook.info

অন্যদিকে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, আহযাব যুদ্ধ ৫ হিজরীর শওয়াল মাসের ঘটনা এবং বনীল মুসতালিকের যুদ্ধ হয় ৬ হিজরীর শাবান মাসে। এ প্রসংগে হযরত আয়েশা (রা) ও অন্যান্য লোকদের থেকে যে অসংখ্য নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলো এর সমর্থন করে। সেগুলো থেকে জানা যায়, মিথ্যা অপবাদের ঘটনার পূর্বে হিজাব বা পরদার বিধান নাযিল হয় আর এ বিধান পাওয়া যায় সূরা আহযাবে। এ থেকে জানা যায়, সে সময় হযরত যয়নবের (রা) সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল এবং এ বিয়ে ৫ হিজরীর যিলকদ মাসের ঘটনা। সূরা আহযাবে এ ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ছাড়া এ হাদীসগুলো থেকে একথাও জানা যায় যে, হযরত যয়নবের (রা) বোন হামনা বিনতে জাহশ হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে অপবাদ ছড়ানোয় শুধুমাত্র এ জন্য অংশ নিয়েছিলেন যে, হযরত আয়েশা তাঁর বোনের সতিন ছিলেন। আর একথা সুস্পষ্ট যে, বোনের সতিনের বিরুদ্ধে এ ধরনের মনোভাব সৃষ্টি হবার জন্য সতিনী সম্পর্ক শুরু হবার পর কিছুকাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। এসব সাক্ষ ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকে শক্তিশালী করে দেয়।

মিথ্যাচারের ঘটনার সময় হযরত সা'দ ইবনে মু'আযের (রা) উপস্থিতির বর্ণনা থাকাটাই এ বর্ণনাটি মেনে নেবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এ ঘটনা প্রসংগে হযরত আয়েশা (রা) থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার কোনটিতে হযরত সা'দ ইবনে মু'আযের কথা বলা হয়েছে আবার কোনটিতে বলা হয়েছে তাঁর পরিবর্তে হযরত উসাইদ ইবনে হুদাইরের (রা) কথা, এ জিনিসটিই এ সংকট দূর করে দেয়। আর এ দ্বিতীয় বর্ণনাটি এ প্রসংগে হযরত আয়েশা বর্ণিত অন্যান্য ঘটনাবলীর সাথে পুরোপুরি খাপখেয়ে যায়। অন্যথায় নিছক সা'দ ইবনে মু'আযের জীবনকালের সাথে খাপ খাওয়াবার জন্য যদি বনীল মুসতালিক যুদ্ধ ও মিথ্যাচারের কাহিনীকে আহযাব ও কুরাইযা যুদ্ধের আগের ঘটনা বলে মেনে নেয়া হয়, তাহলে তো হিজাবের আয়াত নাযিল হওয়া ও যয়নবের (রা) বিয়ের ঘটনা তার পূর্বে সংঘটিত হওয়া উচিত ছিল। এ অবস্থায় এ জটিলতার গ্রন্থী উন্মোচন করা কোনক্রমেই সম্ভব হয় না। অথচ কুরআন ও অসংখ্য সহীহ হাদীস উভয়ই সাক্ষ দিচ্ছে যে, যয়নবের (রা) বিয়ে ও হিজাবের হুকুম আহযাব ও কুরাইযার পরবর্তী ঘটনা। এ কারণেই ইবনে হাযম ও ইবনে কাইয়েম এবং অন্য কতিপয় গবেষক মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকেই সঠিক গণ্য করেছেন এবং আমরাও একে সঠিক মনে করি।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এখন অনুসন্ধানের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হবার পর যে, সূরা নূর ৬ হিজরীর শেষার্ধে সূরা আহযাবের কয়েক মাস পর নাযিল হয়, যে অবস্থায় এ সূরাটি নাযিল হয় তার ওপর আমাদের একটু নজর বুলিয়ে নেয়া উচিত। বদর যুদ্ধে জয়লাভ করার পর আরবে ইসলামী আন্দোলনের যে উত্থান শুরু হয় খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত পৌঁছুতে পৌঁছুতেই তা এত বেশী ব্যাপকতা লাভ করে যার ফলে মুশরিক, ইহুদী, মুনাফিক ও দোমনা সংশয়ী নির্বিশেষে সবাই একথা অনুভব করতে থাকে যে, এ নব উত্থিত শক্তিটিকে শুধুমাত্র অস্ত্র ও সমর শক্তির মাধ্যমে পরাস্ত করা যেতে পারে না। খন্দকের যুদ্ধে তারা এক জোট হয়ে দশ হাজার সেনা নিয়ে মদীনা আক্রমণ করেছিল। কিন্তু মদীনা উপকন্ঠে এক মাস ধরে মাথা

www.icsbook.info

কুটবার পর শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ মনোরথ হয়ে চলে যায়। তাদের ফিরে যাওয়ার সাথে সাথেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করে দেন :

لَنْ تَغْزُوَكُمْ قُرَيْشٌ بَعْدَ عَامِكُمْ هٰذَا وَلٰكِنَّكُمْ تَغْزُوْنَهُمْ

"এ বছরের পর কুরাইশরা আর তোমাদের ওপর হামলা করবে না বরং তোমরা তাদের ওপর হামলা করবে।" (ইবনে হিশাম ২৬৬ পৃষ্ঠা)।

রসূল (সা)-এর এ উক্তি দ্বারা প্রকারান্তরে একথাই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ইসলাম বিরোধী শক্তির অগ্রগতির ক্ষমতা নিশেষ হয়ে গেছে, এবার থেকে ইসলাম আর আত্মরক্ষার নয় বরং অগ্রগতির লড়াই লড়বে এবং কুফরকে অগ্রগতির পরিবর্তে আত্মরক্ষার লড়াই লড়তে হবে। এটি ছিল অবস্থার একেবারে সঠিক ও বাস্তব বিশ্লেষণ। প্রতিপক্ষও ভালোভাবে এটা অনুভব করছিল।

মুসলমানদের সংখ্যা ইসলামের এ উত্তরোত্তর উন্নতির আসল কারণ ছিল না। বদর থেকে খন্দক পর্যন্ত প্রত্যেক যুদ্ধে কাফেররা তাদের চাইতে বেশী শক্তির সমাবেশ ঘটায়। অন্যদিকে জনসংখ্যার দিক দিয়েও সে সময় মুসলমানরা আরবে বড় জোর ছিল দশ ভাগের এক ভাগ। মুসলমানদের উন্নত মানের অস্ত্রসম্ভারও এ উন্নতির মূল কারণ ছিল না। সব ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামে কাফেরদের পাল্লা ভারী ছিল। অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির দিক দিয়েও তাদের সাথে মুসলমানদের কোন তুলনাই ছিল না। কাফেরদের কাছে ছিল সমস্ত আরবের আর্থিক উপায় উপকরণ। অন্যদিকে মুসলমানরা অনাহারে মরছিল। কাফেরদের পেছনে ছিল সমগ্র আরবের মুশরিক সমাজ ও আহলি কিতাব গোত্রগুলো। অন্যদিকে মুসলমানরা একটি নতুন জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে পুরাতন ব্যবস্থার সকল সমর্থকের সহানুভূতি হারিয়ে ফেলেছিল। এহেন অবস্থায় যে জিনিসটি মুসলমানদের ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেটি ছিল আসলে তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব। ইসলামের সকল শত্রুদলই এটা অনুভব করছিল। একদিকে তারা দেখছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের নির্মল নিষ্কলুষ চরিত্র। এ চরিত্রের পবিত্রতা, দৃঢ়তা ও শক্তিমত্তা মানুষের হৃদয় জয় করে চলছে। অন্যদিকে তারা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক নৈতিক পবিত্রতা মুসলমানদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্য, শৃংখলা ও সংহতি সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং এর সামনে মুশরিকদের শিথিল সামাজিক ব্যবস্থাপনা যুদ্ধ ও শান্তি উভয় অবস্থায়ই পরাজয় বরণ করে চলছে।

নিকৃষ্ট স্বভাবের লোকদের বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, তাদের চোখে যখন অন্যের গুণাবলী ও নিজেদের দুর্বলতাগুলো পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে এবং তারা এটাও যখন বুঝতে পারে যে, প্রতিপক্ষের সৎগুণাবলী তাকে এগিয়ে দিচ্ছে এবং তাদের নিজেদের দোষ-ত্রুটিগুলো তাদেরকে নিম্নগামী করছে তখন তাদের মনে নিজেদের ত্রুটিগুলো দূর করে প্রতিপক্ষের গুণাবলীর আয়ত্ব করে নেবার চিন্তা জাগে না, বরং তারা চিন্তা করতে থাকে যেভাবেই হোক নিজেদের অনুরূপ দুর্বলতা তার মধ্যেও ঢুকিয়ে দিতে হবে। আর এটা সম্ভব না হলে কমপক্ষে তার বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার চালাতে হবে, যাতে জনগণ বুঝতে পারে যে, প্রতিপক্ষের যত গুণই থাক, সেই সাথে তাদের কিছু না কিছু দোষ-ত্রুটিও আছে। এ হীন

www.icsbook.info

মানসিকতাই ইসলামের শত্রুদের কর্মতৎপরতার গতি সামরিক কার্যক্রমের দিক থেকে সরিয়ে নিকৃষ্ট ধরনের নাশকতা ও আভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টির দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছে। আর যেহেতু এ কাজটি বাইরের শত্রুদের তুলনায় মুসলমানদের ভেতরের মুনাফিকরা সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারতো তাই পরিকল্পিতভাবে বা পরিকল্পনা ছাড়াই স্থিরিকৃত হয় যে, মদীনার মুনাফিকরা ভেতর থেকে গোলমাল পাকাবে এবং ইহুদী ও মুশরিকরা বাইর থেকে তার ফলে যত বেশী পারে লাভবান হবার চেষ্টা করবে।

৫ হিজরী যিলকদ মাসে ঘটে এ নতুন কৌশলটির প্রথম আত্মপ্রকাশ। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব থেকে পালক পুত্র* সংক্রান্ত জাহেলী রীতি নির্মূল করার জন্য নিজেই নিজের পালক পুত্রের [যায়েদ (রা) ইবনে হারেসা] তালাক দেয়া স্ত্রীকে [যয়নব (রা) বিনতে জাহ্শ] বিয়ে করেন। এ সময় মদীনার মুনাফিকরা অপপ্রচারের এক বিরাট তাণ্ডব সৃষ্টি করে। বাইর থেকে ইহুদী ও মুশরিকরাও তাদের কন্ঠে কন্ঠ মিলিয়ে মিথ্যা অপবাদ রটাতে শুরু করে। তারা অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প তৈরী করে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে থাকে। যেমন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে তার পালক পুত্রের স্ত্রীকে দেখে তার প্রেমে পড়ে যান (নাউযুবিল্লাহ)। কিভাবে পুত্র তাঁর প্রেমের খবর পেয়ে যায় এবং তার পর নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার ওপর থেকে নিজের অধিকার প্রত্যাহার করে; তারপর কিভাবে তিনি নিজের পুত্রবধূকে বিয়ে করেন। এ গল্পগুলো এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয় যে, মুসলমানরাও এগুলোর প্রভাবমুক্ত থাকতে পারেনি। এ কারণে মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরদের একটি দল হযরত যয়নব ও যায়েদের সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলোর মধ্যে আজো ঐসব মনগড়া গল্পের অংশ পাওয়া যায়। পশ্চিমের প্রাচ্যবিদরা খুব ভালো করে লবণ মরিচ মাখিয়ে নিজেদের বইতে এসব পরিবেশন করেছেন। অথচ হযরত যয়নব (রা) ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন ফুফুর (উমাইমাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব) মেয়ে। তাঁর সমগ্র শৈশব থেকে যৌবনকাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখের সামনে অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁকে ঘটনাক্রমে একদিন দেখে নেয়া এবং নাউযুবিল্লাহ তাঁর প্রেমে পড়ে যাওয়ার কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। আবার এ ঘটনার মাত্র এক বছর আগে নবী (সা) নিজেই চাপ দিয়ে তাঁকে হযরত যায়েদকে (রা) বিয়ে করতে বাধ্য করেন। তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাহ্শ এ বিয়েতে অসন্তুষ্ট ছিলেন। হযরত যয়নব (রা) নিজেও এতে রাজী ছিলেন না। কারণ কুরাইশদের এক শ্রেষ্ঠ অভিজাত পরিবারের মেয়ে একজন মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামের পত্নী হওয়াকে স্বভাবতই মেনে নিতে পারতো না। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবলমাত্র মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার সূচনা নিজের পরিবার থেকে শুরু করার জন্যই হযরত যয়নবকে (রা) এ বিয়েতে রাজী হতে বাধ্য করেন। এসব কথা বন্ধু ও শত্রু সবাই জানতো। আর এ কথাও সবাই জানতো, হযরত যয়নবের বংশীয় আভিজাত্যবোধই তাঁর ও যায়েদ ইবনে হারেসার মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্ক স্থায়ী হতে দেয়নি এবং শেষ পর্যন্ত তালাক হয়ে যায়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও নির্লজ্জ মিথ্যা অপবাদকারীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর জঘন্য ধরনের নৈতিক দোষারোপ করে এবং এত ব্যাপক আকারে সেগুলো ছড়ায় যে, আজো পর্যন্ত তাদের এ মিথ্যা প্রচারণার প্রভাব দেখা যায়।

* অন্যের পুত্রকে নিজের পুত্র বানিয়ে নেয়া এবং পরিবারের মধ্যে তাকে পুরোপুরি ঔরশজাত সন্তানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা।

www.icsbook.info

এরপর দ্বিতীয় হামলা করা হয় বনীল মুস্তালিক যুদ্ধের সময়। প্রথম হামলার চাইতে এটি ছিল বেশী মারাত্মক। বনীল মুস্তালিক গোত্রটি বনী খুযা'আর একটি শাখা ছিল। তারা বাস করতো লোহিত সাগর উপকূলে জেদ্দা ও রাবেগের মাঝখানে কুদাইদ এলাকায়। যে ঝরণাধারাটির আশপাশে এ উপজাতীয় লোকেরা বাস করতো তার নাম ছিল মুরাইসী। এ কারণে হাদীসে এ যুদ্ধটিকে মুরাইসী'র যুদ্ধও বলা হয়েছে। চিত্রের মাধ্যমে তাদের সঠিক অবস্থানস্থল জানা যেতে পারে।

৬ হিজরীর শাবান মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর পান, তারা মুসলমানদের ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং অন্যান্য উপাজাতিকেও একত্র করার চেষ্টা করছে। এ খবর পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি ষড়যন্ত্রটিকে অংকুরেই গুঁড়িয়ে দেবার জন্য একটি সেনাদল নিয়ে সেদিকে রওয়ানা হয়ে যান। এ অভিযানে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও বিপুল সংখ্যক মুনাফিকদের নিয়ে তাঁর সহযোগী হয়। ইবনে সা'দের বর্ণনা মতে, এর আগে কোন যুদ্ধেই মুনাফিকরা এত বিপুল সংখ্যায় অংশ নেয়নি। মুরাইসী নামক স্থানে রসূলুল্লাহ (সা) হঠাৎ শত্রুদের মুখোমুখি হন। সামান্য সংঘর্ষের পর যাবতীয় সম্পদ-সরঞ্জাম সহকারে সমগ্র গোত্রটিকে গ্রেফতার করে নেন। এ অভিযান শেষ হবার পর তখনো মুরাইসীতেই ইসলামী সেনা দল অবস্থান করছিল এমন সময় একদিন হযরত উমরের (রা) একজন কর্মচারী (জাহ্জাহ ইবনে মাসউদ গিফারী) এবং খায্রাজ গোত্রের একজন সহযোগীর (সিনান ইবনে ওয়াবর জুহানী) মধ্যে পানি নিয়ে বিরোধ বাধে। একজন আনসারদেরকে ডাকে এবং অন্যজন মুহাজিরদেরকে ডাক দেয়। উভয় পক্ষ থেকে লোকেরা একত্র হয়ে যায় এবং ব্যাপারটি মিটমাট করে দেয়া হয়। কিন্তু আনসারদের খায্রাজ গোত্রের সাথে সম্পর্কিত আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তিলকে তাল করে দেয়। সে আনসারদেরকে একথা বলে উত্তেজিত করতে থাকে যে, "এ মুহাজিররা আমাদের ওপর চড়াও হয়েছে এবং আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এবং এ কুরাইশী কাঙালদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যে, কুকুরকে লালন পালন করে বড় করো যাতে সে তোমাকেই কামড়ায়। এসব কিছু তোমাদের নিজেদেরই কর্মফল। তোমরা নিজেরাই তাদেরকে ডেকে এনে নিজেদের এলাকায় জায়গা দিয়েছো এবং নিজেদের ধন-সম্পত্তিতে তাদেরকে অংশীদার বানিয়েছো। আজ যদি তোমরা তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে দেখবে তারা পগার পার হয়ে গেছে।" তারপর সে কসম খেয়ে বলে, "মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর আমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা সম্পন্ন তারা দীন-হীন-লাঞ্ছিতদেরকে বাইরে বের করে দেবে।"* তার এসব কথাবার্তার খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছুলে হযরত উমর (রা) তাঁকে পরামর্শ দেন, এ ব্যক্তিকে হত্যা করা হোক। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : فَكَيْفَ يَاعُمَرُ اِذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ اَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ اَصْحَابَهُ (হে উমর! দুনিয়ার লোকেরা কি বলবে? তারা বলবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিজেরই সংগী-সাথীদেরকে হত্যা করছে।) তারপর তিনি তখনই সে স্থান থেকে রওয়ানা হবার হুকুম দেন এবং দ্বিতীয় দিন দুপুর পর্যন্ত কোথাও থামেননি, যাতে লোকেরা খুব বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং কারোর এক জায়গায় বসে গলগুজব করার এবং অন্যদের তা শোনার অবকাশ না থাকে। পথে উসাইদ ইবনে হুদাইর

* সূরা মুনাফিকূনে আল্লাহ নিজেই তার এ উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন।

www.icsbook.info

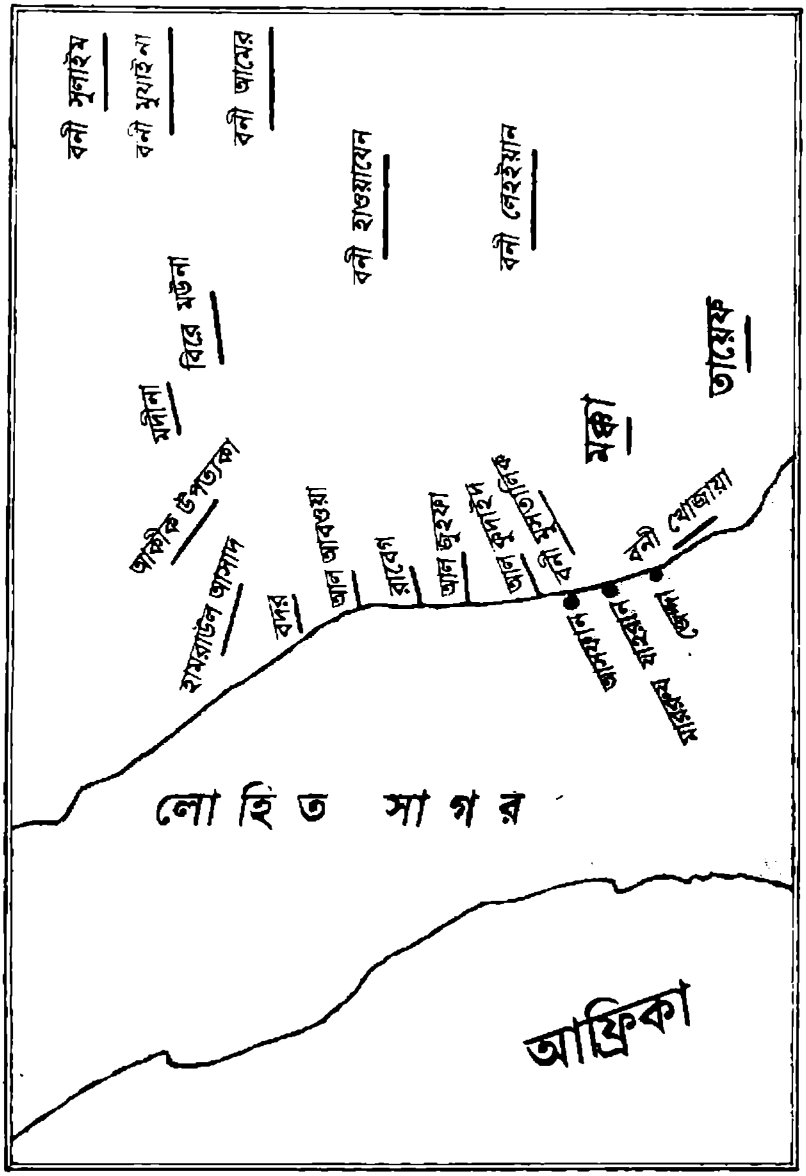

বনিল মুস্তালিক যুদ্ধক্ষেত্রের নক্‌শা

www.icsbook.info

(রা) বলেন, "হে আল্লাহর নবী! আজ আপনি নিজের স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে অসময়ে রওয়ানা হবার হুকুম দিয়েছেন?" তিনি জবাব দেন, "তুমি শোননি তোমাদের সাথী কিসব কথা বলেছে?" তিনি জিজ্ঞেস করেন, "কোন্ সাথী?" জবাব দেন, "আবদুল্লাহ ইবনে উবাই।" তিনি বলেন, "হে আল্লাহর রসূল! ঐ ব্যক্তির কথা বাদ দিন। আপনি যখন মদীনায় আগমন করেন তখন আমরা তাকে নিজেদের বাদশাহ বানাবার ফায়সালা করেই ফেলেছিলাম এবং তার জন্য মুকুট তৈরী হচ্ছিল। আপনার আগমনের ফলে তার বাড়া ভাতে ছাই পড়েছে। তারই ঝাল সে ঝাড়ছে।"

এ হীন কারসাজির রেশ তখনো মিলিয়ে যায়নি। এরি মধ্যে একই সফরে সে আর একটি ভয়াবহ অঘটন ঘটিয়ে বসে। এ এমন পর্যায়ের ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর নিবেদিত প্রাণ সাহাবীগণ যদি পূর্ণ সংযম ধৈর্যশীলতা এবং জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না দিতেন তাহলে মদীনার এ নবগঠিত মুসলিম সমাজটিতে ঘটে যেতো মারাত্মক ধরনের গৃহযুদ্ধ। এটি ছিল হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের ফিত্না। এ ঘটনার বিবরণ হযরত আয়েশার মুখেই শুনুন। তাহলে যথার্থ অবস্থা জানা যাবে। মাঝখানে যেসব বিষয় ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হবে সেগুলো আমি অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মাধ্যমে ব্রাকেটের মধ্যে সন্নিবেশিত করে যেতে থাকবো। এর ফলে হযরত আয়েশার (রা) বর্ণনার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হবে না। তিনি বলেন ঃ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল, যখনই তিনি সফরে যেতেন তখনই স্ত্রীদের মধ্য থেকে কে তাঁর সংগে যাবে তা ঠিক করার জন্য লটারী করতেন।* বনীল মুস্তালিক যুদ্ধের সময় লটারীতে আমার নাম ওঠে। ফলে আমি তাঁর সাথী হই। ফেরার সময় আমরা যখন মদীনার কাছাকাছি এসে গেছি তখন এক মনযিলে রাত্রিকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেলার যাত্রা বিরতি করেন। এদিকে রাত পোহাবার তখনো কিছু সময় বাকি ছিল এমন সময় রওয়ানা দেবার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। আমি উঠে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য যাই। ফিরে আসার সময় অবস্থান স্থলের কাছাকাছি এসে মনে হলো আমার গলার হারটি ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গেছে। আমি তার খোঁজে লেগে যাই। ইত্যবসরে কাফেলা রওয়ানা হয়ে যায়। নিয়ম ছিল, রওয়ানা হবার সময় আমি নিজের হাওদায় বসে যেতাম এবং চারজন লোক মিলে সেটি উঠিয়ে উটের পিঠে বসিয়ে দিতো। সে যুগে আমরা মেয়েরা কম খাবার কারণে বড়ই হালকা পাত্লা হতাম। আমার হাওদা উঠাবার সময় আমি যে তার মধ্যে নেই একথা লোকেরা অনুভবই করতে পারেনি। তারা না জেনে খালি হাওদাটি উঠিয়ে উটের পিঠে বসিয়ে দিয়ে রওয়ানা হয়ে

* এ লটারীর ধরনটি প্রচলিত লটারীর মতো ছিল না। আসলে সকল স্ত্রীর অধিকার সমান ছিল। তাঁদের একজনকে অন্য জনের ওপর প্রাধান্য দেবার কোন যুক্তিসংগত কারণ ছিল না। এখন যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই কাউকে বেছে নিতেন তাহলে স্ত্রীরা মনে ব্যথা পেতেন এবং এতে পারস্পরিক রেষারেষি ও বিদ্বেষ সৃষ্টির আশংকা থাকতো। তাই তিনি লটারীর মাধ্যমে এর ফায়সালা করতেন। শরীয়াতে এমন সব অবস্থার জন্য লটারী করার সুযোগ রাখা হয়েছে। যখন কতিপয় লোকের বৈধ অধিকার হয় একেবারেই সমান সমান এবং তাদের মধ্য থেকে একজনকে অন্যজনের ওপর অগ্রাধিকার দেবার কোন ন্যায়সংগত কারণ থাকে না অথচ অধিকার কেবলমাত্র একজনকেই দেয়া যেতে পারে।

www.icsbook.info

যায়। আমি হার নিয়ে ফিরে এসে দেখি সেখানে কেউ নেই। কাজেই নিজের চাদর মুড়ি দিয়ে আমি সেখানেই শুয়ে পড়ি। মনে মনে ভাবি, সামনের দিকে গিয়ে আমাকে হাওদার মধ্যে না পেয়ে তারা নিজেরাই খুঁজতে খুঁজতে আবার এখানে চলে আসবে। এ অবস্থায় আমি ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তাল সালামী আমি যেখানে শুয়ে ছিলাম সেখান দিয়ে যেতে থাকেন। তিনি আমাকে দেখতেই চিনে ফেলেন। কারণ পরদার হুকুম নাযিল হবার পূর্বে তিনি আমাকে বহুবার দেখেন। (তিনি ছিলেন একজন বদরী সাহাবী। সকালে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকা ছিল তাঁর অভ্যাস।* তাই তিনিও সেনা শিবিরের কোথাও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং এখন ঘুম থেকে উঠে মদীনার দিকে রওয়ানা দিয়েছিলেন।) আমাকে দেখে তিনি উট থামিয়ে নেন এবং স্বতস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী এখানে রয়ে গেছেন?" তাঁর এ আওয়াজে আমার চোখ খুলে যায় এবং আমি উঠে সংগে সংগেই আমার মুখ চাদর দিয়ে ঢেকে নিই। তিনি আমার সাথে কোন কথা বলেননি, সোজা তাঁর উটটি এনে আমার কাছে বসিয়ে দেন এবং নিজে দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন। আমি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে যাই এবং তিনি উটের রশি ধরে এগিয়ে যেতে থাকেন। দুপুরের কাছাকাছি সময়ে আমরা সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দেই। সে সময় সেনাদল এক জায়গায় গিয়ে সবেমাত্র যাত্রা বিরতি শুরু করেছে। তখনো তারা টেরই পায়নি আমি পেছনে রয়ে গেছি। এ ঘটনায় কুচক্রীরা মিথ্যা অপবাদ রটাতে থাকে এবং এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল সবার আগে। কিন্তু আমার সম্পর্কে কিসব কথাবার্তা হচ্ছে সে ব্যাপারে আমি ছিলাম একেবারেই অজ্ঞ।

[অন্যান্য হাদীসে বলা হয়েছে, যে সময় সফওয়ানের উটের পিঠে চড়ে হযরত আয়েশা (রা) সেনা শিবিরে এসে পৌঁছেন এবং তিনি এভাবে পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন বলে জানা যায় তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই চিৎকার করে ওঠে, "আল্লাহর কসম, এ মহিলা নিষ্কলংক অবস্থায় আসেনি। নাও, দেখো তোমাদের নবীর স্ত্রী আর একজনের সাথে রাত কাটিয়েছে এবং সে এখন তাকে প্রকাশ্যে নিয়ে চলে আসছে।"]

মদীনায় পৌঁছেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং প্রায় এক মাসকাল বিছানায় পড়ে থাকি। শহরে এ মিথ্যা অপবাদের খবর ছড়িয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানেও কথা আসতে থাকে। কিন্তু আমি কিছুই জানতাম না। তবে যে জিনিসটি আমার মনে খচ্খচ করতে থাকে তা হচ্ছে এই যে, অসুস্থ অবস্থায় যে রকম দৃষ্টি দেয়া দরকার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি আমার প্রতি তেমন ছিল না। তিনি ঘরে এলে ঘরের লোকদের জিজ্ঞেস করতেন كَيْفَ تِيكُمْ (ও কেমন আছে?)

* আবু দাউদ ও অন্যান্য সুনান গ্রন্থে এ আলোচনা এসেছে, তাঁর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করেন যে, তিনি কখনো ফজরের নামায যথা সময় পড়েন না। তিনি ওজর পেশ করেন, হে আল্লাহর রসূল! এটা আমার পারিবারিক রোগ। সকালে দীর্ঘসময় পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকার এ দুর্বলতাটি আমি কিছুতেই দূর করতে পারি না। একথায় রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : ঠিক আছে, যখনই ঘুম ভাংবে, সংগে সংগেই নামায পড়ে নেবে। কোন কোন মুহাদ্দিস তাঁর কাফেলার পেছনে থেকে যাওয়ার এ কারণ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অন্য কতিপয় মুহাদ্দিস এর কারণ বর্ণনা করে বলেন, রাতের অন্ধকারে রওয়ানা হবার কারণে যদি কারোর কোন জিনিস পেছনে থেকে গিয়ে থাকে তাহলে সকালে তা খুঁজে নিয়ে আসার দায়িত্ব নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ওপর অর্পণ করেছিলেন।

www.icsbook.info

নিজে আমার সাথে কোন কথা বলতেন না। এতে আমার মনে সন্দেহ হতো, নিশ্চয়ই কোন ব্যাপার ঘটেছে। শেষে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমি নিজের মায়ের বাড়িতে চলে গেলাম, যাতে তিনি আমার সেবা শুশ্রূষা ভালোভাবে করতে পারেন।

এক রাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য আমি মদীনার বাইরে যাই। সে সময় আমাদের বাড়িঘরে এ ধরনের পায়খানার ব্যবস্থা ছিল না। ফলে আমরা পায়খানা করার জন্য বাইরে জংগলের দিকে যেতাম। আমার সাথে ছিলেন মিসৃতাহ ইবনে উসাসার মা। তিনি ছিলেন আমার মায়ের খালাত বোন। [অন্য হাদীস থেকে জানা যায়, তাদের সমগ্র পরিবারের ভরণপোষণ হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) জিম্মায় ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও মিসৃতাহ এমন লোকদের দলে ভিড়ে গিয়েছিলেন যারা হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ছড়াচ্ছিল।] রাস্তায় তাঁর পায় ঠোকর লাগে এবং তিনি সংগে সংগে স্বতস্ফূর্তভাবে বলে ওঠেন ঃ "ধ্বংস হোক মিসৃতাহ।" আমি বললাম, "ভালই মা দেখছি আপনি, নিজের পেটের ছেলেকে অভিশাপ দিচ্ছেন, আবার ছেলেও এমন যে বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছে।" তিনি বলেন, "মা, তুমি কি তার কথা কিছুই জানো না?" তারপর তিনি গড়গড় করে সব কথা বলে যান। তিনি বলে যেতে থাকেন, মিথ্যা অপবাদদাতারা আমার বিরুদ্ধে কিসব কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে। [মুনাফিকরা ছাড়া মুসলমানদের মধ্য থেকেও যারা এ ফিতনায় শামিল হয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে মিসৃতাহ, ইসলামের প্রখ্যাত কবি হাস্‌সান ইবনে সাবেত ও হযরত যয়নবের (রা) বোন হাম্‌না বিন্‌তে জাহশের অংশ ছিল সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য।] এ কাহিনী শুনে আমার শরীরের রক্ত যেন শুকিয়ে গেল। যে প্রয়োজন পূরণের জন্য আমি বের হয়েছিলাম তাও ভুলে গেলাম। সোজা ঘরে চলে এলাম। সারা রাত আমার কাঁদতে কাঁদতে কেটে যায়।"

সামনের দিকে এগিয়ে হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ "আমি চলে আসার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী (রা) ও উসামাহ ইবনে যায়েদকে (রা) ডাকেন। তাদের কাছে পরামর্শ চান। উসামাহ (রা) আমার পক্ষে ভালো কথাই বলে। সে বলে, 'হে আল্লাহর রসূল! ভালো জিনিস ছাড়া আপনার স্ত্রীর মধ্যে আমি আর কিছুই দেখিনি। যা কিছু রটানো হচ্ছে সবই মিথ্যা ও বানোয়াট ছাড়া আর কিছুই নয়।' আর আলী (রা) বলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! মেয়ের অভাব নেই। আপনি তাঁর জায়গায় অন্য একটি মেয়ে বিয়ে করতে পারেন। আর যদি অনুসন্ধান করতে চান তাহলে সেবিকা বাঁদীকে ডেকে অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করুন।' কাজেই সেবিকাকে ডাকা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হয়। সে বলে, 'সে আল্লাহর কসম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমি তাঁর মধ্যে এমন কোন খারাপ জিনিস দেখিনি যার ওপর অংগুলি নির্দেশ করা যেতে পারে। তবে এতটুকু দোষ তাঁর আছে যে, আমি আটা ছেনে রেখে কোন কাজে চলে যাই এবং বলে যাই, বিবি সাহেবা! একটু আটার দিকে খেয়াল রাখবেন, কিন্তু তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং বকরি এসে আটা খেয়ে ফেলে।' সেদিনই রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবায় বলেন, 'হে মুসলমানগণ! এক ব্যক্তি আমার পরিবারের ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে আমাকে অশেষ কষ্ট দিচ্ছে। তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, তার আক্রমণ থেকে আমার ইজ্জত বাঁচাতে পারে? আল্লাহর কসম, আমি তো আমার স্ত্রীর মধ্যেও কোন খারাপ জিনিস দেখিনি এবং সে ব্যক্তির মধ্যেও কোন খারাপ জিনিস দেখিনি যার সম্পর্কে অপবাদ দেয়া

www.icsbook.info

হচ্ছে।' সে তো কখনো আমার অনুপস্থিতিতে আমার বাড়ীতেও আসেনি।' একথায় উসাইদ ইবনে হুদাইর (কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী 'দ ইবনে মু'আয*) উঠে বলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! যদি সে আমাদের গোত্রের লোক হয় তাহলে আমরা তাকে হত্যা করবো আর যদি আমাদের ভাই খায্‌রাজদের লোক হয় তাহলে আপনি হুকুম দিন আমরা হুকুম পালন করার জন্য প্রস্তুত।' একথা শুনতেই খায্‌রাজ প্রধান সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা) দাঁড়িয়ে যান এবং বলতে থাকেন, 'মিথ্যা বলছো, তোমরা তাকে কখনোই হত্যা করতে পারো না। তোমরা তাকে হত্যা করার কথা শুধু এ জন্যই মুখে আনছো যে সে খায্‌রাজদের অন্তরভুক্ত। যদি সে তোমাদের গোত্রের লোক হতো তাহলে তোমরা কখনো একথা বলতে না, আমরা তাকে হত্যা করবো।'** উসাইদ ইবনে হুদাইর জবাব দেন, 'তুমি মুনাফিক, তাই মুনাফিকদের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছো।' একথায় মসজিদে নববীতে একটি হাংগামা শুরু হয়ে যায়। অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে বসে ছিলেন। মসজিদের মধ্যেই আওস ও খায্‌রাজের লড়াই বেঁধে যাবার উপক্রম হয়েছিল কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে শান্ত করেন এবং তারপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে আসেন।"

হযরত আয়েশার (রা) অবশিষ্ট কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ আমি এতদসংক্রান্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করবো যেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর ত্রুটি মুক্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে আমি যা কিছু বলতে চাই তা হচ্ছে এই যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এ অপবাদ রটিয়ে একই গুলীতে কয়েকটি পাখি শিকার করার প্রচেষ্টা চালায়। একদিকে সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর সিদ্দীকের (রা) ইজ্জতের ওপর

* সম্ভবত নামের ক্ষেত্রে এ বিভিন্নতার কারণ হচ্ছে এই যে, হযরত আয়েশা (রা) নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে আওস সরদার শব্দ ব্যবহার করে থাকবেন। কোন বর্ণনাকারী এ থেকে সা'দ ইবনে মু'আয মনে করেছেন। কারণ নিজের জীবদ্দশায় তিনিই ছিলেন আওস গোত্রের সরদার এবং ইতিহাসে আওস সরদার হিসেবে তিনিই বেশী পরিচিত। অথচ আসলে এ ঘটনার সময় তাঁর চাচাত ভাই উসাইদ ইবনে হুদাইর ছিলেন আওসের সরদার।

** হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ যদিও অত্যন্ত সৎ ও মুখ্‌লিস মুসলমান ছিলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করতেন এবং মদীনায় যাদের সাহায্যে ইসলাম বিস্তার লাভ করে তাদের মধ্যে তিনিও একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব তবুও এতসব সৎ গুণ সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে স্বজাতিপ্রীতি ও জাতীয় স্বার্থবোধ (আর আরবে সে সময় জাতি বলতে গোত্রই বুঝাতো) ছিল অনেক বেশী। এ কারণে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর পৃষ্ঠপোষকতা করেন, যেহেতু সে ছিল তাঁর গোত্রের লোক। এ কারণেই মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর মুখ থেকে একথা বের হয়ে যায় : اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة (আজ হত্যা ও রক্ত প্রবাহের দিন। আজ এখানে হারামকে হালাল করা হবে।) এর ফলে ক্রোধ প্রকাশ করে রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কাছ থেকে সেনাবাহিনীর ঝাণ্ডা ফিরিয়ে নেন। আবার এ কারণেই তিনি রসূলুল্লাহর (সা) ইন্তিকালের পর সাকীফায়ে বনি সায়েদায় খিলাফত আনসারদের হক বলে দাবী করেন। আর যখন তাঁর কথা অগ্রাহ্য করে আনসার ও মুহাজির সবাই সম্মিলিতভাবে হযরত আবু বকরের (রা) হাতে বাইআত করেন তখন তিনি একাই বাই'আত করতে অস্বীকার করেন। আমৃত্যু তিনি কুরাইশী খলীফার খিলাফত স্বীকার করেননি। (দেখুন আল ইসাবাহ লিইবনে হাজার এবং আল ইস্‌তিআব লিইব্‌নে আবদিল বার এবং সা'দ ইবনে উবাদাহ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১০-১১)

www.icsbook.info

হামলা চালায়। অন্যদিকে ইসলামী আন্দোলনের উন্নততর নৈতিক মর্যাদা ও চারিত্রিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করে। তৃতীয়ত সে এর মাধ্যমে এমন একটি অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করে যে, যদি ইসলাম তার অনুসারীদের জীবন ও চরিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে না ফেলে থাকতো তাহলে মুহাজির ও আনসার এবং স্বয়ং আনসারদেরই দু'টি গোত্র পরস্পর লড়াই করে ধ্বংস হয়ে যেতো।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় বিষয়

এ ছিল সে সময়কার পরিস্থিতি। এর মধ্যে প্রথম হামলার সময় সূরা আহযাবের শেষ ৬টি রুকূ' নাযিল হয় এবং দ্বিতীয় হামলার সময় নাযিল হয় সূরা নূর। এ পটভূমি সামনে রেখে এ দু'টি সূরা পর্যায়ক্রমে অধ্যয়ন করলে এ বিধানগুলোর মধ্যে যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে তা ভালোভাবে অনুধাবন করা যায়।

মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে এমন এক ময়দানে পরাজিত করতে চাচ্ছিল যেটা ছিল তাদের প্রাধান্যের আসল ক্ষেত্র। আল্লাহ তাদের চরিত্র হননমূলক অপবাদ রটনার অভিযানের বিরুদ্ধে একটি ক্রুদ্ধ ভাষণ দেবার বা মুসলমানদেরকে পাল্টা আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে মুসলমানদেরকে এ শিক্ষা দেবার প্রতি তাঁর সার্বিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন যে, তোমাদের নৈতিক অংগনে যেখানে যেখানে শূন্যতা রয়েছে সেগুলো পূর্ণ কর এবং এ অংগনকে আরো বেশী শক্তিশালী করো। একটু আগেই দেখা গেছে যয়নবের (রা) বিয়ের সময় মুনাফিক ও কাফেররা কী হাংগামাটাই না সৃষ্টি করেছিল। অথচ সূরা আহ্যাব বের করে পড়লে দেখা যাবে সেখানে ঠিক সে হাংগামার যুগেই সামাজিক সংস্কার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত নির্দেশগুলো দেয়া হয় ঃ

এক ঃ নবী করীমের (সা) পবিত্র স্ত্রীগণকে হুকুম দেয়া হয় ঃ নিজেদের গৃহমধ্যে মর্যাদা সহকারে বসে থাকো, সাজসজ্জা করে বাইরে বের হয়ো না এবং ভিন পুরুষদের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হলে বিনম্র স্বরে কথা বলো না, যাতে কোন ব্যক্তি কোন অবাঞ্ছিত আশা পোষণ না করে বসে। (৩২ ও ৩৩ আয়াত)

দুই ঃ নবী করীমের (সা) গৃহে ভিন্ পুরুষদের বিনা অনুমতিতে প্রবেশ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং নির্দেশ দেয়া হয়, তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের কাছে কিছু চাইতে হলে পরদার আড়াল থেকে চাইতে হবে। (৫৩ আয়াত)

তিন ঃ গায়ের মাহ্রাম পুরুষ ও মাহ্রাম আত্মীয়দের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং হুকুম দেয়া হয়েছে নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের কেবলমাত্র মাহ্রাম আত্মীয়রাই স্বাধীনভাবে তাঁর গৃহে যাতায়াত করতে পারবেন। (৫৫ আয়াত)

চার ঃ মুসলমানদেরকে বলে দেয়া হয়, নবীর স্ত্রীগণ তোমাদের মা এবং একজন মুসলমানের জন্য তাঁরা চিরতরে ঠিক তার আপন মায়ের মতই হারাম। তাই তাঁদের সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলমানের নিয়ত একদম পাক পবিত্র থাকতে হবে। (৫৩ ও ৫৪ আয়াত)

পাঁচ ঃ মুসলমানদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, নবীকে কষ্ট দেয়া দুনিয়ায় ও আখেরাতে আল্লাহর লানত ও লাঞ্ছনাকর আযাবের কারণ হবে এবং এভাবে

www.icsbook.info

কোন মুসলমানের ইজ্জতের ওপর আক্রমণ করা এবং তার ভিত্তিতে তার ওপর অযথা দোষারোপ করাও কঠিন গোনাহের শামিল। (৫৭ ও ৫৮ আয়াত)

ছয় ঃ সকল মুসলমান মেয়েকে হুকুম দেয়া হয়েছে, যখনই বাইরে বের হবার প্রয়োজন হবে, চাদর দিয়ে নিজেকে ভালোভাবে ঢেকে এবং ঘোমটা টেনে বের হতে হবে। (৫৯ আয়াত)

তারপর যখন হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের ঘটনায় মদীনার সমাজে একটি হাংগামা সৃষ্টি হয়ে যায় তখন নৈতিকতা, সামাজিকতা ও আইনের এমন সব বিধান ও নির্দেশসহকারে সূরা নূর নাযিল করা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত মুসলিম সমাজকে অনাচারের উৎপাদন ও তার বিস্তার থেকে সংরক্ষিত রাখতে হবে এবং যদি তা উৎপন্ন হয়েই যায় তাহলে তার যথাযথ প্রতিকার ও প্রতিরোধ এবং সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ সূরায় এ বিধান ও নির্দেশগুলো যে ধারাবাহিকতা সহকারে নাযিল হয়েছে এখানে আমি সেভাবেই তাদের সংক্ষিপ্তসার সন্নিবেশ করছি। এ দ্বারা কুরআন যথার্থ মনস্তাত্বিক পরিস্থিতিতে মানুষের জীবনের সংশোধন ও সংগঠনের জন্য কি ধরনের আইনগত, নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা ও কৌশল অবলম্বন করার বিধান দেয়, তা পাঠক অনুমান করতে পারবেন ঃ

(১) যিনা, ইতিপূর্বে যাকে সামাজিক অপরাধ গণ্য করা হয়েছিল (সূরা নিসা ঃ ১৫ ও ১৬ আয়াত) এখন তাকে ফৌজদারী অপরাধ গণ্য করে তার শাস্তি হিসেবে একশত বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা হয়।

(২) ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীকে সামাজিকভাবে বয়কট করার হুকুম দেয়া হয় এবং তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে মু'মিনদেরকে নিষেধ করা হয়।

(৩) যে ব্যক্তি অন্যের ওপর যিনার অপবাদ দেয় এবং তারপর প্রমাণস্বরূপ সাক্ষী পেশ করতে পারে না তার শাস্তি হিসেবে ৮০ ঘা বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা হয়।

(৪) স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয় তাহলে তার জন্য "লি'আন"-এর রীতি প্রবর্তন করা হয়।

(৫) হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে মুনাফিকদের মিথ্যা অপবাদ খণ্ডন করে এ নির্দেশ দেয়া হয় যে, যে কোন ভদ্র মহিলা বা ভদ্র লোকের বিরুদ্ধে যে কোন অপবাদ দেয়া হোক, তা চোখবুজে মেনে নিয়ো না এবং তা ছড়াতেও থেকো না। এ ধরনের গুজব যদি রটে যেতে থাকে তাহলে মুখে মুখে তাকে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য না করে তাকে দাবিয়ে দেয়া এবং তার পথ রোধ করা উচিত। এ প্রসংগে নীতিগতভাবে একটি কথা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন ব্যক্তির পবিত্র-পরিচ্ছন্ন নারীর সাথেই বিবাহিত হওয়া উচিত। নষ্টা ও ভ্রষ্টা নারীর আচার-আচরণের সাথে সে দু'দিনও খাপ খাইয়ে চলতে পারবে না। পবিত্র-পরিচ্ছন্ন নারীর ব্যাপারেও একই কথা। তার আত্মা পবিত্র-পরিচ্ছন্ন পুরুষের সাথেই খাপ খাওয়াতে পারে, নষ্ট ও ভ্রষ্ট পুরুষের সাথে নয়। এখন যদি তোমরা রসূলকে (সা) একজন পবিত্র বরং পবিত্রতম ব্যক্তি বলে জেনে থাকো তাহলে কেমন করে একথা তোমাদের বোধগম্য হলো যে, একজন ভ্রষ্টা নারী তার প্রিয়তম জীবন সঙ্গিনী হতে পারতো? যে নারী কার্যত ব্যভিচারে পর্যন্ত লিপ্ত হয়ে যায় তার সাধারণ চালচলন কিভাবে

www.icsbook.info

এমন পর্যায়ের হতে পারে যে, রসূলের মতো পবিত্র ব্যক্তিত্ব তার সাথে এভাবে সংসার জীবন যাপন করবেন। কাজেই একজন নীচ ও স্বার্থান্ধ লোক একটি বাজে অপবাদ কারোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেই তা গ্রহণযোগ্য তো হয়ই না, উপরন্তু তার প্রতি মনোযোগ দেয়া এবং তাকে সম্ভব মনে করাও উচিত নয়। আগে চোখ মেলে দেখতে হবে। অপবাদ কে লাগাচ্ছে এবং কার প্রতি লাগাচ্ছে?

(৬) যারা আজেবাজে খবর ও খারাপ গুজব রটায় এবং মুসলিম সমাজে নৈতিকতা বিরোধী ও অশ্লীল কার্যকলাপের প্রচলন করার প্রচেষ্টা চালায় তাদের ব্যাপারে বলা হয় যে, তাদেরকে উৎসাহিত করা যাবে না বরং তারা শাস্তি লাভের যোগ্য।

(৭) মুসলিম সমাজে পারস্পরিক সুধারণার ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্কের ভিত্ গড়ে উঠতে হবে, এটিকে একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পাপ করার কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে না ততক্ষণ প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্দোষ ও নিরপরাধ মনে করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্দোষ হবার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে দোষী মনে করতে হবে, এটা ঠিক নয়।

(৮) লোকদেরকে সাধারণভাবে নির্দেশ দেয়া হয় যে, একজন অন্যজনের গৃহে নিসংকোচে প্রবেশ করো না বরং অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করো।

(৯) নারী ও পুরুষদেরকে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করার নির্দেশ দেয়া হয়। পরস্পরের দিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে ও উঁকিঝুঁকি মারতে এবং আড়চোখে দেখতে নিষেধ করা হয়।

(১০) মেয়েদের হুকুম দেয়া হয়, নিজেদের গৃহে মাথা ও বুক ঢেকে রাখো।

(১১) মেয়েদের নিজেদের মাহ্‌রাম আত্মীয় ও গৃহপরিচারকদের ছাড়া আর কারোর সামনে সাজগোজ করে না আসার হুকুম দেয়া হয়।

(১২) তাদেরকে এ হুকুমও দেয়া হয় যে, বাইরে বের হলে শুধু যে কেবল নিজেদের সাজসজ্জা লুকিয়ে বের হবে তাই না বরং এমন অলংকার পরিধান করেও বাইরে বের হওয়া যাবে না যেগুলো বাজতে থাকে।

(১৩) সমাজে মেয়েদের ও পুরুষদের বিয়ে না করে আইবুড়ো ও আইবুড়ী হয়ে বসে থাকাকে অপছন্দ করা হয়। হুকুম দেয়া হয়, অবিবাহিতদের বিয়ে দেয়া হোক। এমনকি বাঁদী ও গোলামদেরকেও অবিবাহিত রেখে দেয়া যাবে না। কারণ কৌমার্য ও কুমারিত্ব অশ্লীলতা ও চারিত্রিক অনাচারের প্ররোচনাও দেয়, আবার মানুষকে অশ্লীলতার সহজ শিকারে পরিণত করে। অবিবাহিত ব্যক্তি আর কিছু না হলেও খারাপ খবর শোনার এবং তা ছড়াবার ব্যাপারে আগ্রহ নিতে থাকে।

(১৪) বাঁদী ও গোলাম স্বাধীন করার জন্য "মুকাতাব"-এর পথ বের করা হয়। (মুক্তিপণ দিয়ে স্বাধীন হওয়া) মালিকরা ছাড়া অন্যদেরকেও মুকাতাব বাঁদী ও গোলামদেরকে আর্থিক সাহায্য করার হুকুম দেয়া হয়।

(১৫) বাঁদীদের:কে অর্থোপার্জনের কাজে খাটানো নিষিদ্ধ করা হয়। আরবে বাঁদীদের মাধ্যমেই এ পেশাটি জিইয়ে রাখার রেওয়াজ ছিল। এ কারণে একে নিষিদ্ধ করার ফলে আসলে পতিতাবৃত্তি আইনগতভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

www.icsbook.info

(১৬) পারিবারিক জীবনে গৃহ পরিচারক ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদের জন্য নিয়ম করা হয় যে, তারা একান্ত ব্যক্তিগত সময়গুলোয় (অর্থাৎ সকাল, দুপুর ও রাতে) গৃহের কোন পুরুষ ও মেয়ের কামরায় আকস্মিকভাবে ঢুকে পড়তে পারবে না। নিজের সন্তানদের মধ্যেও অনুমতি নিয়ে গৃহে প্রবেশ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

(১৭) বুড়ীদেরকে অনুমতি দেয়া হয়, তারা যদি স্বগৃহে মাথা থেকে ওড়না নামিয়ে রেখে দেয় তাহলে তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু "তাবাররুজ" (নিজেকে দেখাবার জন্য সাজসজ্জা করা) থেকে দূরে থাকার হুকুম দেয়া হয়। তাছাড়া তাদেরকে নসিহত করা হয়েছে, বার্ধক্যাবস্থায়ও তারা যদি মাথায় কাপড় দিয়ে থাকে তাহলে ভালো।

(১৮) অন্ধ, খঞ্জ, পংগু ও রুগ্নকে এ সুবিধা প্রদান করা হয় যে, তারা বিনা অনুমতিতে কোথাও থেকে কোন খাদ্যবস্তু খেয়ে নিলে তাকে চুরি ও আত্মসাতের আওতায় ফেলা হবে না। এ জন্য তাদেরকে পাকড়াও করা হবে না।

(১৯) নিকট আত্মীয় ও অন্তরংগ বন্ধুদেরকে অনুমতি দেয়া হয় যে, তারা বিনা অনুমতিতে পরস্পরের বাড়িতে খেতে পারে এবং এটা এমন পর্যায়ের যেমন তারা নিজেদের বাড়িতে খেতে পারে। এভাবে সমাজের লোকদেরকে পরস্পরের কাছাকাছি করে দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্য থেকেও অচেনা ও সম্পর্কহীনতার বেড়া তুলে দেয়া হয়েছে। ফলে তাদের পরস্পরের মধ্যে স্নেহ-ভালোবাসা-মায়া-মমতা বেড়ে যাবে এবং পারস্পরিক আন্তরিকতার সম্পর্ক এমন সব ছিদ্র বন্ধ করে দেবে যেগুলোর মাধ্যমে কোন কুচক্রী তাদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করতে পারতো।

এসব নির্দেশের সাথে সাথে মুনাফিক ও মু'মিনদের এমনসব সুস্পষ্ট আলামত বর্ণনা করা হয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলমান সমাজে আন্তরিকতা সম্পন্ন মু'মিন কে এবং মুনাফিক কে তা জানতে পারে। অন্যদিকে মুসলমানদের দলগত শৃংখলা ও সংগঠনকে আরো শক্ত করে বেঁধে দেয়া হয়েছে। এ জন্য আরো কতিপয় নিয়ম-কানুন তৈরী করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, কাফের ও মুনাফিকরা যে শক্তির সাথে টক্কর দিতে গিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ফিত্না-ফাসাদ সৃষ্টি করে চলছিল তাকে আরো বেশী শক্তিশালী করা।

এ সমগ্র আলোচনায় একটি জিনিস পরিষ্কার দেখার মতো। অর্থাৎ বাজে ও লজ্জাকর হামলার জবাবে যে ধরনের তিক্ততার সৃষ্টি হয়ে থাকে সমগ্র সূরা নূরে তার ছিটেফোটাও নেই। একদিকে যে অবস্থায় এ সূরাটি নাযিল হয় তা দেখুন এবং অন্যদিকে সূরার বিষয়বস্তু ও বাকরীতি দেখুন। এ ধরনের উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে কেমন ঠাণ্ডা মাথায় আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। সংস্কারমূলক বিধান দেয়া হচ্ছে। জ্ঞানগর্ভ নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। সর্বোপরি শিক্ষা ও উপদেশ দানের হক আদায় করা হচ্ছে। এ থেকে শুধুমাত্র এ শিক্ষাই পাওয়া যায় না যে, ফিত্নার মোকাবিলায় কঠিন থেকে কঠিনতর উত্তেজক পরিস্থিতিতে আমাদের কেমন ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করে উদার হৃদয়ে বুদ্ধিমত্তা সহকারে এগিয়ে যেতে হবে বরং এ থেকে এ বিষয়েরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এ বাণী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের রচনা নয়, এটা এমন এক সত্তার অবতীর্ণ বাণী যিনি অনেক উচ্চ স্থান থেকে মানুষের অবস্থা ও জীবনাচার প্রত্যক্ষ করছেন এবং নিজ সত্তায় এসব অবস্থা ও জীবনাচারের প্রভাবমুক্ত থেকে নির্জলা পথনির্দেশনা ও বিধান দানের

www.icsbook.info

দায়িত্ব পালন করছেন। যদি এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের বাণী হতো তাহলে তাঁর চরম উদার দৃষ্টি সত্ত্বেও নিজের ইজ্জত আবরুর ওপর জঘন্য আক্রমণের ধারা বিবরণী শুনে একজন সৎ ও ভদ্র লোকের আবেগ অনুভূতিতে অনিবার্যভাবে যে স্বাভাবিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে যায় তার কিছু না কিছু প্রভাব অবশ্যই এর মধ্যে পাওয়া যেতো।

www.icsbook.info

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَدۡخُلُوۡا بُيُوۡتًا غَيۡرَ بُيُوۡتِكُمۡ حَتّٰى تَسۡتَاۡنِسُوۡا
وَتُسَلِّمُوۡا عَلٰٓى اَهۡلِهَا ؕ ذٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُوۡنَ ﴿۲۷﴾

৪ রুকু'

হে ঈমানদারগণ![২৩] নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না গৃহবাসীদের সম্মতি লাভ করো[২৪] এবং তাদেরকে সালাম করো। এটিই তোমাদের জন্য ভালো পদ্ধতি, আশা করা যায় তোমরা এদিকে নজর রাখবে।[২৫]

থেকে পবিত্র। এসবগুলো ব্যাখ্যার অবকাশ আয়াতের শব্দাবলীর মধ্যে আছে। কিন্তু এ শব্দগুলো পড়েই প্রথমেই যে অর্থ মনের মধ্যে বাসা বাঁধে তা হচ্ছে, যা আমি অনুবাদে বর্ণনা করে এসেছি এবং পরিবেশ পরিস্থিতির দিক দিয়েও তার মধ্যে যে তাৎপর্য রয়েছে, অন্য অর্থগুলোর মধ্যে তা নেই।

২৩. সূরার শুরুতে যেসব বিধান দেয়া হয়েছিল সেগুলো ছিল সমাজে অসৎপ্রবণতা ও অনাচারের উদ্ভব হলে কিভাবে তার প্রতিরোধ করতে হবে তা সম্পর্কিত। এখন যেসব বিধান দেয়া হচ্ছে সেগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজে অসৎবৃত্তির উৎপত্তিই রোধ করা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এমনভাবে সংশোধন করা যাতে করে এসব অসৎপ্রবণতা সৃষ্টির পথ বন্ধ হয়ে যায়। এসব বিধান অধ্যয়ন করার আগে দু'টি কথা ভালোভাবে মনের মধ্যে গেঁথে নিতে হবে :

এক : অপবাদের ঘটনার পরপরই এ বিধান বর্ণনা করা পরিষ্কারভাবে একথাই প্রকাশ করে যে, রসূলের স্ত্রীর মতো মহান ও উন্নত ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে এত বড় একটি ডাহা মিথ্যা অপবাদের এভাবে সমাজের অভ্যন্তরে ব্যাপক চর্চা হয়ে যাওয়াকে আল্লাহ সমাজে একটি যৌন কামনাতাড়িত পরিবেশের উপস্থিতির ফল বলে চিহ্নিত করেছেন। আল্লাহর দৃষ্টিতে এ যৌন কামনা তাড়িত পরিবেশকে পরিবর্তনের একমাত্র উপায় এটিই ছিল যে, লোকদের পরস্পরের গৃহে নিঃসংকোচে আসা যাওয়া বন্ধ করতে হবে, অপরিচিত নারী-পুরুষদের পরস্পর দেখা সাক্ষাত ও স্বাধীনভাবে মেলামেশার পথ রোধ করতে হবে, মেয়েদের একটি অতি নিকট পরিবেশের লোকজন ছাড়া গায়ের মুহাররাম আত্মীয়-স্বজন ও অপরিচিতদের সামনে সাজসজ্জা করে যাওয়া নিষিদ্ধ করতে হবে, পতিতাবৃত্তির পেশাকে চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে, পুরুষদের ও নারীদের দীর্ঘকাল অবিবাহিত রাখা যাবে না, এমনকি গোলাম ও বাঁদীদেরও বিবাহ দিতে হবে। অন্য কথায় বলা যায়, মেয়েদের পরদাহীনতা ও সমাজে বিপুল সংখ্যক লোকের অবিবাহিত থাকাকে আল্লাহর জ্ঞান অনুযায়ী এমন সব মৌলিক কার্যকারণ যেগুলোর মাধ্যমে সামাজিক পরিবেশে একটি অননুভূত যৌন কামনা সর্বক্ষণ প্রবহমান থাকে এবং এ যৌন কামনার বশবর্তী হয়ে লোকদের চোখ, কান, কণ্ঠ, মন-মানস সবকিছুই কোন বাস্তব বা কাল্পনিক কেলেংকারিতে (Scandal) জড়িত হবার জন্য সবসময় তৈরী থাকে। এ দোষ ও ত্রুটি সংশোধন করার জন্য আলোচ্য পরদার বিধিসমূহের চেয়ে বেশী নির্ভুল, উপযোগী ও প্রভাবশালী অন্য কোন

www.icsbook.info

কর্মপন্থা আল্লাহর জ্ঞান-ভাণ্ডারে ছিল না। নয়তো তিনি এগুলো বাদ দিয়ে অন্য বিধান দিতেন।

দুই ঃ এ সুযোগে দ্বিতীয় যে কথাটি বুঝে নিতে হবে সেটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহর শরীয়াত কোন অসৎকাজ নিছক হারাম করে দিয়ে অথবা তাকে অপরাধ গণ্য করে তার জন্য শাস্তি নির্ধারিত করে দেয়াই যথেষ্ট মনে করে না বরং যেসব কার্যকারণ কোন ব্যক্তিকে ঐ অসৎকাজে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করে অথবা তার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় কিংবা তাকে তা করতে বাধ্য করে, সেগুলোকেও নিশ্চিহ্ন করে দেয়। তাছাড়া শরীয়াত অপরাধের সাথে সাথে অপরাধের কারণ, অপরাধের উদ্যোক্তা ও অপরাধের উপায়-উপকরণাদির ওপরও বিধি নিষেধ আরোপ করে। এভাবে আসল অপরাধের ধারে কাছে পৌঁছার আগেই অনেক দূর থেকেই মানুষকে রুখে দেয়া হয়। মানুষ সবসময় অপরাধের কাছ দিয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকবে এবং প্রতিদিন পাকড়াও হতে ও শাস্তি পেতে থাকবে, এটাও সে পছন্দ করে না। সে নিছক একজন অভিযোক্তাই (Prosecutor) নয় বরং একজন সহানুভূতিশীল সহযোগী, সংস্কারকারী ও সাহায্যকারীও। তাই সে মানুষকে অসৎকাজ থেকে নিষ্কৃতিলাভের ক্ষেত্রে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই সকল প্রকার শিক্ষামূলক, নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

২৪. মূলে حتى تستانسوا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। লোকেরা সাধারণত একে حتى تستاذنوا (অর্থাৎ যতক্ষণ না অনুমতি নাও) অর্থে ব্যবহার করে। কিন্তু আসলে উভয় ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। একে উপেক্ষা করা চলে না। حتى تستاذنوا বললে আয়াতের অর্থ হতো ঃ "কারোর বাড়িতে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না অনুমতি নিয়ে নাও।" এ প্রকাশ ভংগী পরিহার করে আল্লাহ حتى تستانسوا শব্দ ব্যবহার করেছেন। استيناس শব্দ انس ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আমাদের ভাষায় এর মানে হয় পরিচিতি, অন্তরংগতা, সম্মতি ও প্রীতি। এ ধাতু থেকে উৎপন্ন تستانسوا শব্দ যখনই বলা হবে তখনই এর মানে হবে, সম্মতি আছে কি না জানা অথবা নিজের সাথে অন্তরংগ করা। কাজেই আয়াতের সঠিক অর্থ হবে ঃ "লোকদের গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তাদেরকে অন্তরংগ করে নেবে অথবা তাদের সম্মতি জেনে নেবে।" অর্থাৎ একথা না জেনে নেবে যে, গৃহমালিক তোমার আসাকে অপ্রীতিকর বা বিরক্তিকর মনে করছে না এবং তার গৃহে তোমার প্রবেশকে সে পছন্দ করছে। এ জন্য আমি অনুবাদে "অনুমতি নেবা'র পরিবর্তে 'সম্মতি লাভ' শব্দ ব্যবহার করেছি। কারণ এ অর্থটি মূলের নিকটতর।

২৫. জাহেলী যুগে আরববাসীদের নিয়ম ছিল, তারা حُيِّيتُم صَبَاحًا ، حُيِّيتُم مَسَاءً (সুপ্রভাত, শুভ সন্ধ্যা) বলতে বলতে নিসংকোচে সরাসরি একজন অন্যজনের গৃহে প্রবেশ করে যেতো। অনেক সময় বহিরাগত ব্যক্তি গৃহ মালিক ও তার বাড়ির মহিলাদেরকে বেসামাল অবস্থায় দেখে ফেলতো। আল্লাহ এর সংশোধনের জন্য এ নীতি নির্ধারণ করেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির যেখানে সে অবস্থান করে সেখানে তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা (Privacy) রক্ষা করার অধিকার আছে এবং তার সম্মতি ও অনুমতি ছাড়া তার এ গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করা অন্য ব্যক্তির জন্য জায়েয নয়। এ হুকুমটি নাযিল হবার পর

www.icsbook.info

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমাজে যেসব নিয়ম ও রীতিনীতির প্রচলন করেন আমি নীচে সেগুলো বর্ণনা করছি ঃ

এক ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিগত গোপনীয়তার এ অধিকারটিকে কেবলমাত্র গৃহের চৌহদ্দীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং একে একটি সাধারণ অধিকার গণ্য করেন। এ প্রেক্ষিতে অন্যের গৃহে উঁকি ঝুঁকি মারা, বাইর থেকে চেয়ে দেখা এমন কি অন্যের চিঠি তার অনুমতি ছাড়া পড়ে ফেলা নিষিদ্ধ। হযরত সওবান (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আজাদ করা গোলাম) বর্ননা করেছেন, নবী করীম (সা) বলেন ঃ

اذا دخل البصر فلا اذن

"দৃষ্টি যখন একবার প্রবেশ করে গেছে তখন আর নিজের প্রবেশ করার জন্য অনুমতি নেবার দরকার কি?" (আবু দাউদ)

হযরত হুযাইল ইবনে শুরাহবীল বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের কাছে এলেন এবং ঠিক তাঁর দরজার ওপর দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইলেন। নবী (সা) তাকে বললেন, هكذا عنك ، فانما الاستيذان من النظر "পিছনে সরে গিয়ে দাঁড়াও, যাতে দৃষ্টি না পড়ে সে জন্যই তো অনুমতি চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" (আবু দাউদ) নবী করীমের (সা) নিজের নিয়ম ছিল এই যে, যখন কারোর বাড়িতে যেতেন, দরজার ঠিক সামনে কখনো দাঁড়াতেন না। কারণ সে যুগে ঘরের দরজায় পরদা লটকানো থাকতো না। তিনি দরজার ডান পাশে বা বাম পাশে দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইতেন। (আবু দাউদ) রসূলুল্লাহর (সা) খাদেম হযরত আনাস বলেন, এক ব্যক্তি বাইরে থেকে রসূলের (সা) কামরার মধ্যে উঁকি দিলেন। রসূলুল্লাহর (সা) হাতে সে সময় একটি তীর ছিল। তিনি তার দিকে এভাবে এগিয়ে এলেন যেন তীরটি তার পেটে ঢুকিয়ে দেবেন। (আবু দাউদ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ননা করেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ نَظَرَ فِىْ كِتَابِ اَخِيْهِ بِغَيْرِ اِذْنِهٖ فَانَّمَا يَنْظُرُ فِىْ النَّارِ

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া তার পত্রে চোখ বুলালো সে যেন আগুনের মধ্যে দৃষ্টি ফেললো।" (আবু দাউদ)

বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে, নবী (সা) বলেছেন ঃ

لَوْ اَنَّ امْرَأً اِطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَلَيْهِ مَاكَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ –

"যদি কোন ব্যক্তি তোমার গৃহে উঁকি মারে এবং তুমি একটি কাঁকর মেরে তার চোখ কানা করে দাও, তাহলে তাতে কোন গোনাহ হবে না।"

এ বিষয়বস্তু সম্বলিত অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

www.icsbook.info

مَنِ اطَّلَعَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَفَقَؤُا عَيْنَهُ فَقَدْ هُدِرَتْ عَيْنَهُ

"যে ব্যক্তি কারোর ঘরে উঁকি মারে এবং ঘরের লোকেরা তার চোখ ছেঁদা করে দেয়, তবে তাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না।"

ইমাম শাফেঈ এ হাদীসটিকে একদম শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং তিনি কেউ ঘরের মধ্যে উঁকি দিলে তার চোখ ছেঁদা করে দেবার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু হানাফীগণ এর অর্থ নিয়েছেন এভাবে যে, নিছক দৃষ্টি দেবার ক্ষেত্রে এ হুকুমটি দেয়া হয়নি। বরং এটি এমন অবস্থায় প্রযোজ্য যখন কোন ব্যক্তি বিনা অনুমতিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, গৃহবাসীদের বাধা দেয়ায়ও সে নিরস্ত হয় না এবং গৃহবাসীরা তার প্রতিরোধ করতে থাকে। এ প্রতিরোধ ও সংঘাতের মধ্যে যদি তার চোখ ছেঁদা হয়ে যায় বা শরীরের কোন অংগহানি হয় তাহলে এ জন্য গৃহবাসীরা দায়ী হবে না। (আহকামুল কুরআন-জাস্‌সাস, ৩য় খণ্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা)

দুই ঃ ফকীহগণ শ্রবণ শক্তিকেও দৃষ্টিশক্তির হুকুমের অন্তরভুক্ত করেছেন। যেমন অন্ধ ব্যক্তি যদি বিনা অনুমতিতে আসে তাহলে তার দৃষ্টি পড়বে না ঠিকই কিন্তু তার কান তো গৃহবাসীদের কথা বিনা অনুমতিতে শুনে ফেলবে। এ জিনিসটিও দৃষ্টির মতো ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারে অবৈধ হস্তক্ষেপ।

তিন ঃ কেবলমাত্র অন্যের গৃহে প্রবেশ করার সময় অনুমতি নেবার হুকুম দেয়া হয়নি বরং নিজের মা-বোনদের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি নিতে হবে। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি আমার মায়ের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি চাইবো? জবাব দিলেন, হাঁ। সে বললো, আমি ছাড়া তাঁর সেবা করার আর কেউ নেই। এ ক্ষেত্রে কি আমি যতবার তাঁর কাছে যাবো প্রত্যেকবার অনুমতি নেবো? জবাব দিলেন, اتحب ان تراها عريانة "তুমি কি তোমার মাকে উলংগ অবস্থায় দেখতে পছন্দ কর?" (ইবনে জারীর এ মুরসাল হাদীসটি আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের উক্তি হচ্ছে, عليكم ان تستانئوا على امهاتكم واخواتكم "নিজেদের মা-বোনদের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি নিয়ে যাও।" (ইবনে কাসীর) বরং ইবনে মাসউদ তো বলেন, নিজের ঘরে নিজের স্ত্রীর কাছে যাবার সময়ও অন্ততপক্ষে গলা খাঁকারী দিয়ে যাওয়া উচিত। তাঁর স্ত্রী যয়নবের বর্ণনা হচ্ছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ যখনই গৃহে আসতে থাকতেন তখনই আগেই এমন কোন আওয়াজ করে দিতেন যাতে তিনি আসছেন বলে জানা যেতো। তিনি হঠাৎ ঘরের মধ্যে এসে যাওয়া পছন্দ করতেন না। (ইবনে জারীর)

চার ঃ শুধুমাত্র এমন অবস্থায় অনুমতি চাওয়া জরুরী নয় যখন কারোর ঘরে হঠাৎ কোন বিপদ দেখা দেয়। যেমন, আগুন লাগে অথবা কোন চোর ঢোকে। এ অবস্থায় সাহায্য দান করার জন্য বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা যায়।

পাঁচ ঃ প্রথম প্রথম যখন অনুমতি চাওয়ার বিধান জারি হয় তখন লোকেরা তার নিয়ম কানুন জানতো না। একবার এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসে

www.icsbook.info

এবং দরজা থেকে চিৎকার করে বলতে থাকে ألج (আমি কি ভেতরে ঢুকে যাবো?) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বাঁদী রওযাহকে বলেন, এ ব্যক্তি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। একটু উঠে গিয়ে তাকে বলে এসো, السلام عليكم ادخل ؟ (আসসালামু আলাইকুম, আমি কি ভিতরে আসতে পারি?) বলতে হবে। (ইবনে জারির ও আবু দাউদ) জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমি আমার বাবার ঋণের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম এবং দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম, আমি। তিনি দু-তিনবার বললেন, "আমি? আমি?" অর্থাৎ এখানে আমি বললে কে কি বুঝবে যে, তুমি কে? (আবু দাউদ) কালাদাহ ইবনে হাম্বল নামে এক ব্যক্তি কোন কাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলেন। সালাম ছাড়াই এমনিই সেখানে গিয়ে বসলেন। তিনি বললেন, বাইরে যাও এবং আস্সালামু আলাইকুম বলে ভেতরে এসো। (আবু দাউদ) অনুমতি চাওয়ার সঠিক পদ্ধতি ছিল, মানুষ নিজের নাম বলে অনুমতি চাইবে। হযরত উমরের (রা) ব্যাপারে বর্ণিত আছে, নবী করীমের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে তিনি বলতেন :

السلام عليكم يارسول الله ايدخل عمر ؟

"আস্সালামু আলাইকুম, হে আল্লাহর রসূল! উমর কি ভেতরে যাবে?" (আবু দাউদ)

অনুমতি নেবার জন্য নবী করীম (সা) বড় জোর তিনবার ডাক দেবার সীমা নির্দেশ করেছেন এবং বলেছেন যদি তিনবার ডাক দেবার পরও জবাব না পাওয়া যায়, তাহলে ফিরে যাও। (বুখারী মুসলিম, আবু দাউদ) নবী (সা) নিজেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। একবার তিনি হযরত সা'দ ইবনে উবাদার বাড়ীতে গেলেন এবং আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলে দু'বার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু ভেতর থেকে জবাব এলো না। তৃতীয় বার জবাব না পেয়ে তিনি ফিরে গেলেন। হযরত সা'দ ভেতর থেকে দৌড়ে এলেন এবং বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার আওয়াজ শুনছিলাম। কিন্তু আমার মন চাচ্ছিল আপনার মুবারক কন্ঠ থেকে আমার জন্য যতবার সালাম ও রহমতের দোয়া বের হয় ততই ভালো, তাই আমি খুব নীচুস্বরে জবাব দিচ্ছিলাম। (আবু দাউদ ও আহমাদ) এ তিনবার ডাকা একের পর এক হওয়া উচিত নয় বরং একটু থেমে থেমে হতে হবে। এর ফলে ঘরের লোকেরা যদি কাজে ব্যস্ত থাকে এবং সে জন্য তারা জবাব দিতে না পারে তাহলে সে কাজ শেষ করে জবাব দেবার সুযোগ পাবে।

ছয় : গৃহমালিক বা গৃহকর্তা অথবা এমন এক ব্যক্তির অনুমতি গ্রহণযোগ্য হবে যার সম্পর্কে মানুষ যথার্থই মনে করবে যে, গৃহকর্তার পক্ষ থেকে সে অনুমতি দিচ্ছে। যেমন, গৃহের খাদেম অথবা কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। কোন ছোট শিশু যদি বলে, এসে যান, তাহলে তার কথায় ভেতরে প্রবেশ করা উচিত নয়।

সাত : অনুমতি চাওয়ার ব্যাপারে অযথা পীড়াপীড়ি করা অথবা অনুমতি না পাওয়ার দরজার ওপর অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জায়েয নয়। যদি তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর গৃহকর্তার পক্ষ থেকে অনুমতি না পাওয়া যায় বা অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়, তাহলে ফিরে যাওয়া উচিত।

www.icsbook.info

فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ
قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨﴾
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۗ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا
مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ
بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٣٠﴾

তারপর যদি সেখানে কাউকে না পাও, তাহলে তাতে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তোমাদের অনুমতি দেয়া হয়।[২৬] আর যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও তাহলে ফিরে যাবে, এটিই তোমাদের জন্য বেশী শালীন ও পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি[২৭] এবং যা কিছু তোমরা করো আল্লাহ তা খুব ভালোভাবেই জানেন। তবে তোমাদের জন্য কোন ক্ষতি নেই যদি তোমরা এমন গৃহে প্রবেশ করো যেখানে কেউ বাস করে না এবং তার মধ্যে তোমাদের কোন কাজের জিনিস আছে[২৮] তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো ও যা কিছু গোপন করো আল্লাহ সবই জানেন।

হে নবী! মু'মিন পুরুষদের বলে দাও তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে[২৯] এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করে।[৩০] এটি তাদের জন্য বেশী পবিত্র পদ্ধতি। যা কিছু তারা করে আল্লাহ তা জানেন।

২৬. অর্থাৎ কারোর শূন্য গৃহে প্রবেশ করা জায়েয নয়। তবে যদি গৃহকর্তা নিজেই প্রবেশকারীকে তার খালি ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়ে থাকে, তাহলে প্রবেশ করতে পারে। যেমন গৃহকর্তা আপনাকে বলে দিয়েছেন, যদি আমি ঘরে না থাকি, তাহলে আপনি আমার কামরায় বসে যাবেন। অথবা গৃহকর্তা অন্য কোন জায়গায় আছেন এবং আপনার আসার খবর পেয়ে তিনি বলে পাঠিয়েছেন, আপনি বসুন, আমি এখনই এসে যাচ্ছি। অন্যথায় গৃহে কেউ নেই অথবা ভেতর থেকে কেউ বলছে না নিছক এ কারণে বিনা অনুমতিতে ভেতরে ঢুকে যাওয়া কারোর জন্য বৈধ নয়।

২৭. অর্থাৎ এ জন্য নারাজ হওয়া বা মন খারাপ করা উচিত নয়। কোন ব্যক্তি যদি কারো সাথে দেখা করতে না চায় তাহলে তার অস্বীকার করার অধিকার আছে। অথবা কোন কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে সে অক্ষমতা জানিয়ে দিতে পারে। ফকীহগণ ارْجِعُوْا (ফিরে যাও) এর হুকুমের এ অর্থ নিয়েছেন যে, এ অবস্থায় দরজার সামনে গ্যাঁট হয়ে

www.icsbook.info

দাঁড়িয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই বরং সেখান থেকে সরে যাওয়া উচিত। অন্যকে সাক্ষাত দিতে বাধ্য করা অথবা তার দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে তাকে বিরক্ত করতে থাকার অধিকার কোন ব্যক্তির নেই।

২৮. এখানে মূলত হোটেল, সরাইখানা, অতিথিশালা, দোকান, মুসাফির খানা ইত্যাদি যেখানে লোকদের জন্য প্রবেশের সাধারণ অনুমতি আছে সেখানকার কথা বলা হচ্ছে।

২৯. মূল শব্দগুলো হচ্ছে يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ এখানে غَضٌّ মানে হচ্ছে, কোন জিনিস কম করা, হ্রাস করা ও নিচু করা। غض بصر এর অনুবাদ সাধারণত করা হয়, "দৃষ্টি নামিয়ে নেয়া বা রাখা।" কিন্তু আসলে এ হুকুমের অর্থ সবসময় দৃষ্টি নিচের দিকে রাখা নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, পূর্ণ দৃষ্টিভরে না দেখা এবং দেখার জন্য দৃষ্টিকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে না দেয়া। "দৃষ্টি সংযত রাখা" থেকে এ অর্থ ভালোভাবে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ যে জিনিসটি দেখা সংগত নয় তার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে হবে। এ জন্য দৃষ্টি নত করাও যায় আবার অন্য কোন দিকে নজর ঘুরিয়েও নেয়া যায়। مِنْ أَبْصَارِهِمْ এর মধ্যে مِنْ (মিন) "কিছু" বা "কতক" অর্থ প্রকাশ করছে। অর্থাৎ সমস্ত দৃষ্টি সংযত করার হুকুম দেয়া হয়নি বরং কোন কোন দৃষ্টি সংযত করতে বলা হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, আল্লাহর উদ্দেশ্য এ নয় যে, কোন জিনিসই পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয় বরং তিনি কেবলমাত্র একটি বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে দৃষ্টির ওপর এ বিধি-নিষেধ আরোপ করতে চান। এখন পূর্বাপর আলোচনা থেকে জানা যায়, এ বিধি-নিষেধ যে জিনিসের ওপর আরোপ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে, পুরুষদের মহিলাদেরকে দেখা অথবা অন্যদের লজ্জাস্থানে দৃষ্টি দেয়া কিংবা অশ্লীল দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকা।

আল্লাহর কিতাবের এ হুকুমটির যে ব্যাখ্যা হাদীস করেছে তার বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেয়া হলো ঃ

এক ঃ নিজের স্ত্রী বা মুহাররাম নারীদের ছাড়া কাউকে নজর ভরে দেখা মানুষের জন্য জায়েয নয়। একবার হঠাৎ নজর পড়ে গেলে ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় মনে হলে সেখানে আবার দৃষ্টিপাত করা ক্ষমাযোগ্য নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের দেখাকে চোখের যিনা বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মানুষ তার সমগ্র ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যিনা করে। দেখা হচ্ছে চোখের যিনা, ফুসলানো কন্ঠের যিনা, তৃপ্তির সাথে কথা শোনা কানের যিনা, হাত লাগানো ও অবৈধ উদ্দেশ্য নিয়ে চলা হাত ও পায়ের যিনা। ব্যভিচারের এ যাবতীয় ভূমিকা যখন পুরোপুরি পালিত হয় তখন লজ্জাস্থানগুলো তাকে পূর্ণতা দান করে অথবা পূর্ণতা দান থেকে বিরত থাকে। (বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ) হযরত বুরাইদাহ বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলীকে (রা) বলেন ঃ

يَا عَلِيُّ لاَ تَتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

"হে আলী! এক নজরের পর দ্বিতীয় নজর দিয়ো না। প্রথম নজর তো ক্ষমাপ্রাপ্ত কিন্তু দ্বিতীয় নজরের ক্ষমা নেই।" (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী)

www.icsbook.info

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ চোখ পড়ে গেলে কি করবো? বললেন, চোখ ফিরিয়ে নাও অথবা নামিয়ে নাও। (মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রেওয়ায়াত করেছেন, নবী (সা) আল্লাহর উক্তি বর্ণনা করেছেন :

إِنَّ النَّظَرَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِي أَبْدَلْتُهُ إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ -

"দৃষ্টি হচ্ছে ইবলীসের বিষাক্ত তীরগুলোর মধ্য থেকে একটি তীর, যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে তা ত্যাগ করবে আমি তার বদলে তাকে এমন ঈমান দান করবো যা'র মিষ্টি সে নিজের হৃদয়ে অনুভব করবে"। (তাবারানী)

আবু উমামাহ রেওয়ায়াত করেছেন, নবী (সা) বলেন :

مَامِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا -

"যে মুসলমানের দৃষ্টি কোন মেয়ের সৌন্দর্যের ওপর পড়ে এবং সে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, এ অবস্থায় আল্লাহ তার ইবাদাতে বিশেষ স্বাদ সৃষ্টি করে দেন।" (মুসনাদে আহমাদ)

ইমাম জা'ফর সাদেক তাঁর পিতা ইমাম মুহাম্মাদ বাকের থেকে এবং তিনি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারীর থেকে রেওয়ায়াত করেছেন : বিদায় হজ্জের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাত ভাই ফযল ইবনে আব্বাস (তিনি সে সময় ছিলেন একজন উঠতি তরুণ) মাশ'আরে হারাম থেকে ফেরার পথে নবী করীমের (সা) সাথে তাঁর উটের পিঠে বসেছিলেন। পথে মেয়েরা যাচ্ছিল। ফযল তাদেরকে দেখতে লাগলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখের ওপর হাত রাখলেন এবং তাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন। (আবু দাউদ) এ বিদায় হজ্জেরই আর একটি ঘটনা। খাস্'আম গোত্রের একজন মহিলা পথে রসূলুল্লাহকে (সা) থামিয়ে দিয়ে হজ্জ সম্পর্কে একটি বিধান জিজ্ঞেস করছিলেন। ফযল ইবনে আব্বাস তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখ ধরে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন। (বুখারী, তিরমিযী, আবু দাউদ)

দুই : এ থেকে কেউ যেন এ ভুল ধারণা করে না বসেন যে, নারীদের মুখ খুলে চলার সাধারণ অনুমতি ছিল তাইতো চোখ সংযত করার হুকুম দেয়া হয়। অন্যথায় যদি চেহারা ঢেকে রাখার হুকুম দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে আবার দৃষ্টি সংযত করার বা না করার প্রশ্ন আসে কেন? এ যুক্তি বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়েও ভুল এবং ঘটনার দিক দিয়েও সঠিক নয়। বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে এর ভুল হবার কারণ হচ্ছে এই যে, চেহারার পরদা সাধারণভাবে প্রচলিত হয়ে যাবার পরও হঠাৎ কোন নারী ও পুরুষের সামনাসামনি হয়ে যাবার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। আর একজন পরদানশীন মহিলারও কখনো মুখ খোলার

www.icsbook.info

প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। অন্যদিকে মুসলমান মহিলারা পরদা করা সত্ত্বেও অমুসলিম নারীরা তো সর্বাবস্থায় পরদার বাইরেই থাকবে। কাজেই নিছক দৃষ্টি সংযত করার হুকুমটি মহিলাদের মুখ খুলে ঘোরাফেরা করাকে অনিবার্য করে দিয়েছে, এ যুক্তি এখানে পেশ করা যেতে পারে না। আর ঘটনা হিসেবে এটা ভুল হবার কারণ এই যে, সূরা আহযাবে হিজাবের বিধান নাযিল হবার পরে মুসলিম সমাজে যে পরদার প্রচলন করা হয়েছিল চেহারার পরদা তার অন্তরভুক্ত ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক যুগে এর প্রচলন হবার ব্যাপারটি বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অপবাদের ঘটনা সম্পর্কে হযরত আয়েশার হাদীস অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত। তাতে তিনি বলেন, জংগল থেকে ফিরে এসে যখন দেখলাম কাফেলা চলে গেছে তখন আমি বসে পড়লাম এবং ঘুম আমার দু'চোখের পাতায় এমনভাবে জেঁকে বসলো যে, আমি ওখানেই ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তাল সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। দূর থেকে কাউকে ওখানে পড়ে থাকতে দেখে কাছে এলেন।

فَعَرَفَنِىْ حِيْنَ رَاٰنِىْ وَكَانَ قَدْ رَاٰنِىْ قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهٖ حِيْنَ عَرَفَنِىْ فَخَمَرْتُ وَجْهِىْ بِجِلْبَابِىْ -

"তিনি আমাকে দেখতেই চিনে ফেললেন। কারণ পরদার হুকুম নাযিল হবার আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে চিনে ফেলে যখন তিনি 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন' পড়লেন তখন তাঁর আওয়াজে আমার চোখ খুলে গেলো এবং নিজের চাদরটি দিয়ে মুখ ঢেকে নিলাম।" (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, ইবনে জারীর, সীরাতে ইবনে হিশাম)

আবু দাউদের কিতাবুল জিহাদে একটি ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে উম্মে খাল্লাদ নাম্নী এক মহিলার ছেলে এক যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছিল। তিনি তার সম্পর্কে জানার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। কিন্তু এ অবস্থায়ও তার চেহারা নেকাব আবৃত ছিল। কোন কোন সাহাবী অবাক হয়ে বললেন, এ সময়ও তোমার মুখ নেকাবে আবৃত? অর্থাৎ ছেলের শাহাদাতের খবর শুনে তো একজন মায়ের শরীরের প্রতি কোন নজর থাকে না, বেহুঁশ হয়ে পড়ে অথচ তুমি এক দম নিশ্চিন্তে নিজেকে পরদাবৃত করে এখানে হাজির হয়েছো। জবাবে তিনি বলতে লাগলেন ঃ ان ارزا ابنى فلن ارزا حيائى "আমি পুত্র তো হারিয়েছি ঠিকই কিন্তু লজ্জা তো হারাইনি"। আবু দাউদেই হযরত আয়েশার হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, এক মহিলা পরদার পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন পেশ করেন। রসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেন, এটা মহিলার হাত না পুরুষের? মহিলা বলেন, মহিলারই হাত। বলেন, "নারীর হাত হলে তো কমপক্ষে নখ মেহেদী রঞ্জিত হতো।" আর হজ্জের সময়ের যে দু'টি ঘটনার কথা আমরা ওপরে বর্ণনা করে এসেছি সেগুলো নববী যুগে চেহারা খোলা রাখার পক্ষে দলীল হতে পারে না। কারণ ইহ্‌রামের পোশাকে নেকাব ব্যবহার নিষিদ্ধ। তবুও এ অবস্থায়ও সাবধানী মেয়েরা ভিন্ পুরুষদের সামনে চেহারা খোলা রাখা পছন্দ করতেন না। হযরত আয়েশার বর্ণনা, বিদায় হজ্জের সফরে আমরা ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় মক্কার দিকে যাচ্ছিলাম। মুসাফিররা যখন

www.icsbook.info

আমাদের কাছ দিয়ে যেতে থাকতো তখন আমরা মেয়েরা নিজেদের মাথা থেকে চাদর টেনে নিয়ে মুখ ঢেকে নিতাম এবং তারা চলে যাবার পর মুখ আবরণমুক্ত করতাম। (আবু দাউদ, অধ্যায় ঃ মুখ আবৃত করা যেখানে হারাম)

তিন ঃ যেসব অবস্থায় কোন স্ত্রীলোককে দেখার কোন যথার্থ প্রয়োজন থাকে কেবলমাত্র সেগুলোই দৃষ্টি সংযত করার হুকুমের বাইরে আছে। যেমন কোন ব্যক্তি কোন মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। এ উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র মেয়েটিকে দেখার অনুমতি আছে। বরং দেখাটা কমপক্ষে মুস্তাহাব তো অবশ্যই। মুগীরাহ ইবনে শু'বা বর্ণনা করেন, আমি এক জায়গায় বিয়ের প্রস্তাব দেই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, মেয়েটিকে দেখে নিয়েছো তো? আমি বলি, না। বলেন ঃ

انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما

"তাকে দেখে নাও। এর ফলে তোমাদের মধ্যে অধিকতর একাত্মতা সৃষ্টি হওয়ার আশা আছে।" (আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারেমী)

আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি কোথাও বিয়ের পয়গাম দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ انظر اليها فان فى اعين الانصار شيئا "মেয়েটিকে দেখে নাও। কারণ আনসারদের চোখে কিছু দোষ থাকে।" (মুসলিম, নাসাঈ, আহমাদ)

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَقَدَرَ اَنْ يَّرٰى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوْهُ اِلٰى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ -

"তোমাদের কেউ যখন কোন মেয়েকে বিয়ে করার ইচ্ছা করে তখন যতদূর সম্ভব তাকে দেখে নিয়ে এ মর্মে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত যে, মেয়েটির মধ্যে এমন কোন গুণ আছে যা তাকে বিয়ে করার প্রতি আকৃষ্ট করে।" (আহমাদ ও আবু দাউদ)

মুসনাদে আহমাদে আবু হুমাইদাহর বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) এ উদ্দেশ্যে দেখার অনুমতিকে فلاجناح عليه শব্দগুলোর সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ এমনটি করায় ক্ষতির কিছু নেই। তাছাড়া মেয়েটির অজান্তেও তাকে দেখার অনুমতি দিয়েছেন। এ থেকেই ফকীহগণ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অন্যভাবে দেখার বৈধতার বিধানও উদ্ভাবন করেছেন। যেমন অপরাধ অনুসন্ধান প্রসংগে কোন সন্দেহজনক মহিলাকে দেখা অথবা আদালতে সাক্ষ দেবার সময় কাযীর কোন মহিলা সাক্ষীকে দেখা কিংবা চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের রুগিনীকে দেখা ইত্যাদি।

চার ঃ দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশের এ অর্থও হতে পারে যে, কোন নারী বা পুরুষের সতরের প্রতি মানুষ দৃষ্টি দেবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ اِلٰى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ اِلٰى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ -

www.icsbook.info

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص

আর হে নবী! মু'মিন মহিলাদের বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে[৩১] এবং তাদের লজ্জাস্থানগুলোর হেফাজত করে[৩২] আর[৩৩] তাদের সাজসজ্জা না দেখায়,[৩৪] যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় তা ছাড়া।[৩৫] আর তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল দিয়ে তাদের বুক ঢেকে রাখে।[৩৬]

"কোন পুরুষ কোন পুরুষের লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দেবে না এবং কোন নারী কোন নারীর লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দেবে না।" (আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

হযরত আলী (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, নবী করীম (সা) আমাকে বলেন ঃ لا تنظر الى فخذ حى ولا ميت "কোন জীবিত বা মৃত মানুষের রানের ওপর দৃষ্টি দিয়ো না।" (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

৩০. লজ্জাস্থানের হেফাজত অর্থ নিছক প্রবৃত্তির কামনা থেকে দূরে থাকা নয় বরং নিজের লজ্জাস্থানকে অন্যের সামনে উন্মুক্ত করা থেকে দূরে থাকাও বুঝায়। পুরুষের জন্য সতর তথা লজ্জাস্থানের সীমানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ عورة الرجل مابين سرته الى ركبته "পুরুষের সতর হচ্ছে তার নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত।" (দারুকুত্নী ও বাইহাকী) শরীরের এ অংশ স্ত্রী ছাড়া আর কারোর সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে খোলা হারাম। আসহাবে সুফ্ফার দলভুক্ত হযরত জারহাদে আসলামী বর্ণনা করেছেন, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে আমার রান খোলা অবস্থায় ছিল। নবী করীম (সা) বললেন ঃ اما علمت ان الفخذ عورة ؟ "তুমি কি জানো না, রান ঢেকে রাখার জিনিস?" (তিরমিযী, আবু দাউদ, মুআত্তা) হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ لا تبرز (يا لا تكشف) فخذك "নিজের রান কখনো খোলা রাখবে না।" (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) কেবল অন্যের সামনে নয়, একান্তেও উলংগ থাকা নিষিদ্ধ। তাই নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

اِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّىَ فَاِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ اِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِيْنَ يُفْضِى الرَّجُلُ اِلٰى اَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوْهُمْ وَاَكْرِمُوْهُمْ –

"সাবধান, কখনো উলংগ থেকো না। কারণ তোমাদের সাথে এমন সত্তা আছে যারা কখনো তোমাদের থেকে আলাদা হয় না (অর্থাৎ কল্যাণ ও রহমতের ফেরেশতা),

www.icsbook.info

তোমরা যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দাও অথবা স্ত্রীদের কাছে যাও সে সময় ছাড়া। কাজেই তাদের থেকে লজ্জা করো এবং তাদেরকে সম্মান করো।" (তিরমিযী)

অন্য একটি হাদীসে নবী করীম (সা) বলেন :

احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك

"নিজের স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া বাকি সবার থেকে নিজের সতরের হেফাজত করো।"

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, আর যখন আমরা একাকী থাকি? জবাব দেন : فالله تبارك وتعالى احق ان يستحيا منه "এ অবস্থায় আল্লাহ থেকে লজ্জা করা উচিত, তিনিই এর বেশী হকদার।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)।

৩১. নারীদের জন্যও পুরুষদের মতো দৃষ্টি সংযমের একই বিধান রয়েছে। অর্থাৎ তাদের ইচ্ছা করে ভিন্ পুরুষদের দেখা উচিত নয়। ভিন্ পুরুষদের প্রতি দৃষ্টি পড়ে গেলে ফিরিয়ে নেয়া উচিত এবং অন্যদের সতর দেখা থেকে দূরে থাকা উচিত। কিন্তু পুরুষদের পক্ষে মেয়েদেরকে দেখার তুলনায় মেয়েদের পক্ষে পুরুষদেরকে দেখার ব্যাপারে কিছু ভিন্ন বিধান রয়েছে। একদিকে হাদীসে আমরা এ ঘটনা পাচ্ছি যে, হযরত উম্মে সালামাহ ও হযরত উম্মে মাইমূনাহ নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসেছিলেন এমন সময় হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম এসে গেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় স্ত্রীকে বললেন, احتجبا منه "তার থেকে পরদা করো।" স্ত্রীরা বললেন :

يا رسول الله اليس اعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا

"হে আল্লাহর রসূল! তিনি কি অন্ধ নন? তিনি আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না এবং চিনতেও পাচ্ছেন না।" বললেন : افعميا وان انتما، الستما تبصرانه "তোমরা দুজনও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছো না?" হযরত উম্মে সালামাহ (রা) পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, ذالك بعد ان امر بالحجاب "এটা যখন পরদার হুকুম নাযিল হয়নি সে সময়কার ঘটনা"। (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী) এবং মুআত্তার একটি রেওয়ায়াত এর সমর্থন করে, যাতে বলা হয়েছে : হযরত আয়েশার কাছে একজন অন্ধ এলেন এবং তিনি তার থেকে পরদা করলেন। বলা হলো, আপনি এর থেকে পরদা করছেন কেন? এ-তো আপনাকে দেখতে পারে না। উম্মুল মু'মিনীন (রা) এর জবাবে বললেন : لكني انظر اليه "কিন্তু আমি তো তাকে দেখছি।" অন্যদিকে আমরা হযরত আয়েশার একটি হাদীস পাই, তাতে দেখা যায়, ৭ হিজরী সনে হাবশীদের প্রতিনিধি দল মদীনায় এলো এবং তারা মসজিদে নববীর চত্বরে একটি খেলার আয়োজন করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে হযরত আয়েশাকে এ খেলা দেখালেন। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ) তৃতীয় দিকে আমরা দেখি, ফাতেমা বিনতে কায়েসকে যখন তাঁর স্বামী তিন তালাক দিলেন তখন প্রশ্ন দেখা দিল তিনি কোথায় ইদ্দত পালন করবেন। প্রথমে নবী করীম (সা) বললেন, উম্মে শরীক আনসারীয়ার কাছে থাকো। তারপর বললেন, তার কাছে আমার সাহাবীগণ অনেক বেশী যাওয়া আশা করে (কারণ তিনি ছিলেন একজন বিপুল ধনশালী ও দানশীলা মহিলা। বহু লোক তাঁর বাড়িতে মেহমান থাকতেন এবং তিনি তাদের মেহমানদারী

www.icsbook.info